পরিবেশ ও পরিবহন সেক্টরের হুমকি

ভারতীয় গাড়ী কার স্বার্থে?

জামাল উদ্দিন বারী

বিংশ শতাব্দীর দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ন আমাদের জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ– এ প্রশ্নের জবাবে এখন সচেতন ব্যক্তিমাত্রই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়বেন। কারণ একবিংশ শতকে বিশ্বের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। শিল্পোন্নত দেশগুলো এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এখন জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। যারা শিল্পবৈভবে সারাবিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে– জীবনমানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কাতারে নিজেদের অবস্থান সু-সংহত করেছে, তারাই আজ শিল্পোন্নত দেশের তকমাধারী। নিজেদের এই অবস্থান তৈরী করতে তাদের নিজেদের পরিবেশ প্রকৃতিরও কিছুটা ক্ষতি সাধন করতে হয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক। সেই ক্ষতি কমিয়ে আনতে ওরা এখন অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দিকে ঝুঁকছে। আমাদের শ্রমশক্তি আমাদের কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীলতার পাশাপাশি ওদের পুরনো মেয়াদোত্তীর্ণ উৎপাদন যন্ত্রাংশ আমাদের মত অনুন্নত ভূখণ্ডে প্রতিস্থাপিত করে তার লভ্যাংশ হাতিয়ে নিচ্ছে ওরা। আর এসব মেয়াদোত্তীর্ণ মেশিনারিজ আমাদের মত দরিদ্র দেশের আকাশ, বাতাস, পরিবেশ ও জলস্থলকে দূষিত করে তুলেছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্র ও অনুন্নত দেশগুলোর অন্যতম। অথচ আমাদের পরিবেশ দূষণের মাত্রা যে কোন শিল্পোন্নত দেশের চেয়ে অনেক বেশী। অনেকে এর জন্য আমাদের বিশাল জনসংখ্যার ঘনত্বকে দায়ী করে থাকেন। অবশ্যই অধিক জনসংখ্যা পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে, কিন্তু এ দেশের শতকরা আশিভাগ কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষ আমাদের নাগরিক পরিদূষণে কতটা দায়ী? ঢাকা শহর পৃথিবীর ভয়াবহ দূষণের শিকার শহরগুলোর অন্যতম। ঢাকার বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইড, লিড ও ধুলো-বালির পরিমাণ মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের নদীগুলো যেমন একদিকে নাব্যতা হারাচ্ছে, অন্যদিকে ভয়াবহ দূষণে বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে অনেক নদীর পানিসম্পদ। নদী তীরবর্তী শিল্প-কারখানার বর্জ্য অব্যবস্থাপনা, উজানে ভারতের একতরফা নদীশাসন, বাঁধ নির্মাণ ও পানি প্রত্যাহার আমাদের নদীগুলোর দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভয়াবহ দূষণ প্রক্রিয়ার পশ্চাতে বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তির হাত রয়েছে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী নদীপথগুলো আমাদের রেলপথ ও রেল পরিবহন ক্রমশ সংকুচিত ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার পর আমাদের সড়ক পথগুলো এখন প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি রাষ্ট্রস্বার্থবিরোধী ও বিদেশী স্বার্থের অনুকূল কর্মকাণ্ডের পেছনে দেশীয় এজেন্ট ও মুনাফালোভী ব্যক্তি ও সংস্থার ভূমিকা থাকে। যারা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিনিময়ে বিদেশী সরকার অথবা কর্পোরেট শক্তির স্বার্থে কাজ করে থাকে। নাগরিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রবাহের মূল শক্তিই হচ্ছে দেশের পরিবহন সেক্টর। পরিবহন সেক্টরকে কুক্ষিগত করে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে জিম্মি করে বিরাট অংকের মুনাফা হাতিয়ে নেয়াও এই কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের পাঁচ বছরে পরিবহন সেক্টরের সীমাহীন নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি ও তৎজনিত অচলাবস্থায় নাগরিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। সরকারী সড়ক পরিবহন সংস্থা বিআরটিসি নানা রকম দুর্নীতি ও অব্যস্থাপনায় মুখ থুবড়ে পড়লে কিছু কিছু বেসরকারী বিনিয়োগকারী সুযোগ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান যারা ভারতীয় টাটা গাড়ীর এদেশীয় এজেন্ট, তারা দেশের পরিবহন সেক্টরকে নিজেদের

দূষণ ও যানজট নিরসনের লক্ষ্যেও জোট সরকার বেশ কিছু সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রথমতঃ পরিবেশ দূষণ রোধে পলিথিন সামগ্রী নিষিদ্ধ করার কার্যকর পদক্ষেপটি সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। দিতীয়তঃ ঢাকায় টু-স্ট্রোক বেবীটেক্সী ও বিশ বছরের পুরনো যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ঘটনাটিও নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী সাহসী পদক্ষেপ। কিন্তু এসব প্রশংসনীয় উদ্যোগের পেছনেও কি মুনাফালোভী চক্রের প্রচ্ছন্ন হাত ছিল? তা না হলে এত বড় ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এত তাড়াহুড়োর কোন কারণ ছিল না এবং হাজার হাজার বিভিন্ন ক্যাটাগোরির গাড়ীকে রাজপথ থেকে উঠিয়ে দিলে যে শূন্যতা ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে তা কি কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাত ছিল? বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়, জোট সরকারের প্রথম বছরেই ভারত থেকে সীমান্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রায় ১০,০০০ ভারতীয় গাড়ী বাংলাদেশে আমদানী করা হয়। এসব গাড়ী এতটাই নিম্নমানের যে, কয়েক মাস যেতে না যেতেই অনেক গাড়ী বিকল হয়ে পড়ে। অনেক বিনিয়োগকারীই তাদের বড় ধরনের পুঁজি হারায়। দেশের শহরগুলোতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজন এতদিন বিদেশী রিকন্ডিশন গাড়ীর ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রধানত জাপানী জনপ্রিয় ব্রান্ডের রিকন্ডিশন গাড়ীগুলো বাংলাদেশে সহজলভ্য। কিন্তু জোট সরকার হঠাৎ করেই রিকন্ডিশন গাড়ীর ওপর নিষেধাজ্ঞায়ও কড়াকড়ি আরোপ করে এবং এই সুযোগে ভারতীয় নিম্নমানের নতুন গাড়ীতে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে শহরের রাজপথ। পরিবেশ দূষণের দোহাই দিয়ে রিকন্ডিশন গাড়ীর ওপর নানান শর্ত আরোপ করলেও জানা যায়, এসব নিম্নমানের ভারতীয় গাড়ী জাপানী রিকন্ডিশন বা পুরানো গাড়ীর চাইতে অনেক বেশী বায়ুদূষণ করে থাকে। অন্যদিকে রিকন্ডিশন গাড়ীগুলো বেশকয়েক বছর চলার পরও রি-সেল ভ্যালু থাকে, অন্যদিকে ভারতীয় নতুন গাড়ীর স্থায়িত্ব এত কম যে, এগুলোর নাকি কোন রি-সেল ভ্যালু থাকে না। যেখানে ১৫-২০ বছরের পুরনো জাপানী গাড়ীর বাজার মূল্য রয়েছে, সেখানে ২-৩ বছরের ভারতীয় গাড়ীর কোন বাজার মূল্য অবশিষ্ট থাকছে না। আর একেকটি ভারতীয় গাড়ীর পরিবেশ দূষণের মাত্রা জাপানী গাড়ীর তুলনায় কোন কোন ক্ষেত্রে দশগুণ বেশী। সরকার পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের পরও শহরে বায়ুদূষণের হার কমেনি। তার প্রধান কারণ হচ্ছে অতিনিম্নমানের ভারতীয় গাড়ীর যথেষ্ট বিচরণ। ইতোমধ্যে সুয়েপ (সোসাইটি ফর আরবান এনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন) এবং বারভিটা (বাংলাদেশ রিকন্ডিশন ভেহিকলস ইম্পোর্টার্স এন্ড ডিলার্স এসোসিয়েশন) সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষণা দিয়েছে– 'ভারতীয় নতুন গাড়ী জাপানী ও অন্যান্য দেশের রিকন্ডিশন ও পুরানো গাড়ীর তুলনায় বেশী পরিবেশ দূর্ষণ করছে।' ভারতীয় গাড়ী আমদানীকারক অথবা সরকারের পক্ষ থেকে তাদের এ দাবীর বিপক্ষে কোন মতামত বা তথ্যপ্রমাণ দেয়ার কোন তথ্য আমাদের জানা নেই। বরং আমরা দেখছি যেসব রুটে নতুনভাবে বিআরটিসিতে ভারতীয় গাড়ী বাস চালু করা

হয়েছিল, মাত্র এক বছরের মাথায় এসব রুটে মারাত্মক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে দোতলা বাস চালু করে বিআরটিসি। চালুর এক বছরের মধ্যেই সদ্য আমদানী করা গাড়ীগুলো খুব দ্রুত বিকল হয়ে জনপরিবহনে দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ বেসরকারী পরিবহন সংস্থাকে এ রুটে বাস নামানোর অনুমতি দেয়। একদিনে ৩-৪টি গাড়ীকে রাস্তায় বিকল হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এরপর যথারীতি ভারতীয় স্বার্থেই পরিচালিত হচ্ছে পরিবহন সেক্টরের যাবতীয় কর্মতৎপরতা। একদিকে যোগাযোগ মন্ত্রী অত্যাধুনিক পাতাল রেল, ম্যাগনেটিক ল্যাটিভেশন ট্রেন চালুর স্বপ্ন দেখাচ্ছেন দেশবাসীকে, পরিবেশ দূষণের দোহাই দিয়ে রাতারাতি বন্ধ করে দিলেন হাজার হাজার পুরনো গাড়ী ও টু-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার, অন্যদিকে দেশ ভরিয়ে তুলছেন আরও মারাত্মক দূষণকারী ভারতীয় গাড়ীতে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা চিন্তা করে বিদেশ থেকে জনপ্রিয় মডেলের রিকন্ডিশন গাড়ী আমদানীর সুযোগ করে দেন। সেই থেকে এসব রিকন্ডিশন গাড়ীগুলো ঢাকাসহ দেশের শহরগুলোতে দাপটের সাথেই চলে আসছিল। ঢাকার রাস্তায় বৈচিত্র্যময় জাপানী রকমারী গাড়ীর বহর পার্শ্ববর্তী দেশের নাগরিকদের কাছে ঈর্ষণীয় বিষয়

ছিল।

বিগত সরকারের আমলে সূচিত পরিকল্পনার আওতায় বর্তমান সরকারের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ পরিবহন সেক্টরে যে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন, তা কাদের পক্ষে যাচ্ছে? পরিবেশ দূষণে ভারতীয় নতুন গাড়ীর ভূমিকা

চট্টগ্রাম বন্দরে আটকে রাখা হয়েছে। বারভিডা'র মতে সরকার দেশবাসীর কষ্টার্জিত অর্থে কতিপয় লোককে বিলিয়নিয়র বানাতে চায়। পরিবহন সেক্টরে বন্ধাত্ব সৃষ্টি করা এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে বাংলাদেশকে ভারতীয় গাড়ীর ডাম্পিং স্টেশনে পরিণত করার বিতর্কিত ভূমিকার প্রশ্নে সরকারকে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে।

লেখক ঃ কবি, সাংবাদিক ও কলামিস্ট

কেশবপুরের হনুমান আর দহগ্রামের জনগণ

ড. মনজুর আলম

ঢাকার দুটি দৈনিকের ছোট্ট খবর। ছোট হলেও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম খবর কেশবপুরের হনুমানদের নিয়ে। পরেরটি দহগ্রাম আঙ্গরপোতার জনগণের ওপর।

খবরে প্রকাশ, কেশবপুরে প্রায় চার/পাঁচ শত হনুমান বাস করে। তাদের আশ্রয়স্থল ও জীবননির্ভর বনাঞ্চল মানুষের কারণে উজাড় হওয়ায় দুর্লভ প্রজাতির এই বন্য প্রাণীর অস্তিত্ব আজ সংকটের সম্মুখীন। হনুমানগুলো আজ আশ্রয়হীন। খাদ্যাভাবে অসহায় হয়ে মানুষ পরিবৃত পরিবেশ শহরে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কোন বিকল্প না পেয়ে তারা অনেক সময়ে মানুষের ফসলে হাত দেয় জীবন বাঁচাতে। নিরামিষভোজী এসব বন্যপ্রাণীর অসহায়ত্ব দেখে এক বেসরকারী সাহায্য সংস্থা স্থানীয় পশু হাসপাতালের সম্মুখে নিজেদের খরচায় খাদ্য সরবরাহ করছে। খবর জেনে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। মানব তার মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছে। এতে করে হনুমানদের জীবন বাঁচবে। মানুষের ফসল রক্ষা পাবে। সর্বোপরি বিরল প্রজাতির অসহায় হনুমানগুলোর অস্তিত্ব রক্ষা হবে।

অপর খবর হচ্ছে, দহগ্রাম আঙ্গরপোতার জনগণ ২৬ জুন 'বন্দী মুক্তি দিবস' পালন করেছে। কেন বন্দী মুক্তি দিবস? তারা কি অপরাধী? না, তারা অপরাধী নয় বরং অপরাধের শিকার! তারা বাংলাদেশেরই মানুষ। বাংলাদেশেই বাস করছে অথচ বিনা অপরাধে বন্দী। অবাক হলেও সত্যি! মানব সৃষ্ট

ভৌগোলিক কারাগারে তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে সেই ১৯৪৭ সাল থেকে। ভারতে কুচবিহার তাদের ঘিরে রেখেছে। যার ফলশ্রুতিতে দহগ্রামের মানুষ আজও প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা, মাসে ১৫ দিন, বছরে ৬ মাস বন্দী!

দহগ্রামের মানুষ দেশে বাস করেও প্রবাস জীবন কাটাচ্ছে! ১৯৯২ সালের ২৬ জুন তারা সর্বপ্রথম নিজ দেশ বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে শুধুমাত্র দিনের বেলা এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর আসার অনুমতি পায়! তখনো বাধ্য হয় প্রতিদিন ১৮ ঘণ্টার বন্দী জীবন কাটাতে! ২০০১ সাল অবধি দীর্ঘ ৯ বছরের মধ্যে ৬-৭ বছরেরও বেশী সময় কাটাতে হয়েছে বন্দী অবস্থায়! ২০০১ সাল থেকে তাদের বন্দী সময় কমেছে। এখন তাদের প্রতিদিন রাতের ১২ ঘণ্টা বন্দী থাকতে হচ্ছে!

পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল, হাজারো সুবিধা ভরা বিমানবন্দরে বেশ কিছু ঘণ্টা আটকে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসে। আর এ তো হাজারো সুবিধা ভরা বিমানবন্দর নয়, ভারত ঘেরা দহগ্রাম। আর ঘণ্টা বা মাস নয়, বছরের পর

দিবস।’ তারা মুক্তি চায়। তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের মত বাস করতে চায়। পৃথিবীকে

জানাতে চায় তাদের নিরপরাধ বন্দিত্বের কথা।

দুটি ঘটনা দুটি ভিন্ন এলাকার। তবে দুটি ঘটনাই বাংলাদেশের। একটি হনুমানের জীবন ও অপরটি মানুষের জীবন সংক্রান্ত। দুটি ভিন্ন প্রজাতির হলেও ঘটনা দুটি বিশ্লেষণ করলে অদ্ভূত সব সাদৃশ্য আমাদের অবাক করবে :

কেশবপুরের হনুমানগুলোর বাসস্থান মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনে কেটে জ্বালানি ও গৃহস্থালির কাজে লাগানোতে হনুমানগুলো আজ গৃহহীন। তাদের মুক্ত স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়েছে। তাদের

স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। কেশবপুরের হনুমানগুলো মানুষের পরিকল্পনাহীনতা, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞতার নির্মম শিকার। ঠিক তেমনি দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার মানুষগুলোও পরিকল্পনাহীনতা, অবিবেচনা ও অমানবিকতার শিকার। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মানচিত্র অবিবেচনাপ্রসূত বিন্যাসের ফলে ভূখণ্ডটির অবস্থান ঘিরে ফেলা হয় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমার এলাকা দিয়ে। যদিও এ এলাকা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান যা আজকের বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় সন্নিবেশিত করা হয়। কোনপ্রকার অন্যায় ব্যতিরেকেই দহগ্রামের মানুষদের বন্দী করা হয়। বিনা বিচারে বিনা দোষে তাদের নব্য আন্দামানসম দহগ্রামে কারাবাস দেয়া হয়। কেশবপুরের হনুমানগুলো আজ যেমন মানুষের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে খাবার নিতে গেলে বন্দুকের গুলী, তীরের আঘাত বা লাঠির আঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে; তেমনি দহগ্রামের মানুষগুলোও আজ মানব সৃষ্ট সীমান্ত ও পার্শ্ববর্তী দেশের মানুষের নির্মমতার শিকার হচ্ছে। চরম বিপদের সময়ে, জরুরী প্রয়োজনে বেরুলে তাঁরা নাজেহাল হচ্ছে। জীবনরক্ষার প্রয়োজনে নিজ দেশে আসতে চাইলে বিএসএফ ও ভারতীয় নাগরিকদের হাতে মৃত্যুবরণও করতে হচ্ছে। কেশবপুরের হনুমানগুলোর মতোই দহগ্রামের মানুষ আজ বড়ই অসহায়।

মানুষের কারণে কেশবপুরের হনুমানগুলো প্রকৃতির স্বাভাবিকতা ও জীবনের কর্মমুখরতা হতে বঞ্চিত। মানুষের লোভ ও অজ্ঞতার কারণে তারা হারিয়েছে নিজস্ব আবাসস্থল। ইচ্ছে করলেই আর ফিরে পাচ্ছে না তাদের বনাঞ্চল। তাদের জীবন এখন দয়ার ওপর নির্ভরশীল। তেমনি দহগ্রাম আঙ্গরপোতার ১৫ হাজার মানুষও সাধারণ নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে মরে গেলেও তারা আসতে পারছে না আপন দেশে! স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও তাদের বাস করতে হচ্ছে অমানবিক বন্দী অবস্থায়। নিজের দেশ থেকেও তাদের যেন কিছুই নেই। কেশবপুরের হনুমানদের মত দহগ্রামের মানুষদেরও বিনা অপরাধে শাস্তি দেয়া হয়েছে। আজ তারা অন্যের দয়ার ওপর নির্ভরশীল!

কেশবপুরের হনুমানগুলো নাকি মানুষের মতোই ব্যবহার করে। মানুষের সাথে তাদের যে শুধু মিল আছে, তাই নয়, কেউ মারতে গেলে তারা হাত জোর করে মাফ চায়। কেউ যদি অন্যায়ভাবে আঘাত করে হনুমানগুলো নাকি কোর্ট-দালানের পাশে লাইন ধরে বসে ধরনা দেয়। মনে হয় যেন বিচার চাইছে। দহগ্রামের মানুষ হনুমান নয়। তাই মনে হওয়ার কোন কারণ নেই। তারা সত্যিই বিচার চাইছে। ১৫ হাজারেরও বেশী নিরপরাধ মানুষ বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ ও বিশ্ববাসীর কাছে বিচার চাইছে। বাংলাদেশের মানুষের কাছে, নিজের আপনজনের কাছে আকুতি করছে তাদের যেন ভুলে না যায়। সবার সাহায্য যে তাদের বড্ড প্রয়োজন। তারা বিচার চাইছে। অন্যায়ের প্রতিকার চাইছে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণে কেশবপুরের হনুমানদের ভাগ্য ভাল। খবরটা প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই এগিয়ে এসেছেন হনুমানদের সাহায্যার্থে। এটাই যথাযথ এবং অত্যন্ত মহান কাজ। হনুমানরা প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতির ভারসাম্যের ওপরই মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল। হনুমানদের সাহায্য করে আমরা প্রকৃত নিজেদেরই সাহায্য করছি। কেশবপুরের হনুমানদের সাহায্যে আরও মানুষ এগিয়ে আসবে আশা করি।

কিন্তু দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার মানুষগুলোর কি হবে? ১৯৪৭ সাল থেকে ২০০৩ সাল! লম্বা সময়। বাংলাদেশ

নাগরিকও যদি কোথাও বন্দী থাকে বা দেশে আসতে বাধা দেয়, তখন সে দেশ কি না করে! মনে আছে কি, আমেরিকার একজন নাগরিক বাংলাদেশের জেলে হিরোইন সংক্রান্ত অপরাধে আটকে ছিল? তাকে ছুটিয়ে নিতে বিল রিচার্ডসনের মত লোক দেন-দরবার করতে এসেছিলেন এবং তাকে সঙ্গে নিয়েই তিনি ফিরেছিলেন। সে কথা কি আমরা ভুলে গিয়েছি? উন্নত দেশের একজন নাগরিকও যদি কোথাও আটকে থাকে বা কেউ আটক করে রাখে, তখন সেটা হয় খবরের শিরোনাম। সকল সংবাদের মূল। আর বাংলাদেশের ১৫ হাজারেরও বেশী নাগরিক বিনা দোষে বন্দী হয়ে আছে অথচ কতবার তাদের খবর সংবাদের শিরোনাম হয়েছে? বাংলাদেশে কত মানুষ দহগ্রামের মানুষের দুঃখের খবর জানে? আমরা কি প্রশ্ন করতে পারি না– কত সরকার এসেছে, সরকার গিয়েছে অথচ এ সমস্যার সমাধান হচ্ছে না কেন? বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি কত শত বার ভারত সফর করেছেন। মন্ত্রী মহোদয়রা কত না দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেছেন। দহগ্রামের মানুষ, যারা বাংলাদেশীও বটে তাদের কথা কতবার আলোচনায় এসেছে?

আজকের বিশ্বে সকল বিষয়ই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়। তাই প্রশ্ন আসে, দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা দহগ্রামসহ অন্যান্য ছিটমহলে বন্দী বাংলাদেশীদের মুক্তির কথা ভারতের কাছে কতবার উত্থাপন করেছেন? ভারত সরকার কি জবাব দিয়েছে? বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের সময় এ সমস্যার সমাধান সন্নিবেশিত করার কথা কেন মনে হয়নি? ভারতের পক্ষে প্রচণ্ড অনুকূল বাণিজ্য ব্যবসা সম্প্রসারণ হতে পারে ট্রানজিট, ট্রানশিপমেন্ট করিডোরের প্রসঙ্গ আসতে পারে। অথচ দহগ্রামের মানুষ বাংলাদেশে আসার সার্বক্ষণিক করিডোর সুযোগ পাবে না– এটা কেন মেনে নেয়া হচ্ছে? মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হতে পারে কিন্তু বাংলাদেশী নাগরিকরা মুক্তভাবে নিজেদের দেশে আসতে পারবে না, সেটা কেন? সমস্যার সমাধান যদি দ্বিপাক্ষিকভাবে ৫৬ বছরেও সম্ভব না হয় তখন এ সমস্যার কথা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টা কেন নেয়া হচ্ছে না? অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রের ‘Good office’-এর সাহায্য নেয়ার কথা কেন বিবেচনা করা হচ্ছে না? ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের জবাব দেশের মানুষ আজ জানতে চায়।

প্রবাসী বাংলাদেশীরাও জনমত সৃষ্টি করে দহগ্রাম আঙ্গরপোতার মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারেন। প্রয়োজনে International Human Rights Commission-কে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার জন্য আবেদন করতে পারেন। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট জনগণ ও প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশ ভাগের সময় ‘বৃটিশ রাজতন্ত্রের প্রতিনিধি’ কর্তৃক অযৌক্তিক ভাগাভাগিতে দহগ্রাম আঙ্গরপোতার ১৫ হাজার মানুষ দীর্ঘ ৫৬ বছর যে বন্দী জীবন কাটাচ্ছে, তার সমাধান ও বৃটিশ সরকারের কাছে যথাযথ ক্ষতিপূরণ চেয়ে International Court of Justice, European Court of Human Rights সহ অন্যান্য মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে সমস্যা উত্থাপন ও বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন সুযোগ পর্যালোচনা করতে পারেন। সম্প্রতি http//dohogram.tripod.com ওয়েব-সাইট-এর মাধ্যমে দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতার বাংলাদেশী নাগরিকদের বন্দী জীবনের কথা বিশ্বের কাছে তুলে ধরার ও সচেতনতা সৃষ্টির একটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দহগ্রামের মানুষ আজ অসহায়ের মত আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তারা মুক্তি চায়। স্বাধীন দেশের নাগরিকের মত তারা পৃথিবীতে বাঁচতে চায়।

বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল ও দলের নেতৃবৃন্দ অন্তত এই একটি বিষয়ে একসাথে কাজ করে ১৫ হাজার বাংলাদেশীকে মুক্ত করুন। তারা নিরপরাধ। তারা আমাদের দেশেরই নাগরিক। তারা করুণ চোখে চেয়ে আছে দেশের মানুষের দিকে। দেশ স্বাধীন হল, আমরা স্বাধীনতা পেলাম– কিন্তু তাদের তো মুক্তি আসেনি। আর কতদিন তারা মুক্তির প্রহর গুনবে? কবে আসবে ‘মুক্তি’ দহগ্রাম আঙ্গরপোতার বন্দী মানুষগুলোর? ৫৬ বছর কি যথেষ্ট সময় নয়? কেশবপুরের হনুমানগুলোর পাশাপাশি দহগ্রামের মানুষগুলোর সাহায্যেও এগিয়ে আসুন। ওরা যে আপনার-আমার মতই মানুষ!

লেখক ঃ শিক্ষক, গবেষক, কলামিস্ট

ভূমিকম্প ঃ ঝুঁকিপূর্ণ ফ্লট লাইনে বাংলাদেশ

উমর ফারুক আল-হাদী

বাংলাদেশে ঘন ঘন ভূমিকম্পের ফলে ক্রমাগত বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে। ভূমিকম্পের মতো মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির আশংকার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য দেশে কোন কার্যকর কর্মসূচীও নেই। এমনকি দেশের একমাত্র ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটি রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকায়নেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছে। দেশের একমাত্র ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটি ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। দীর্ঘ ৪৭ বছর পূর্বে স্থাপিত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটি বর্তমানে নিজেই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই যুগেও ভূকম্পন রেকর্ডের জন্য পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটিকে আধুনিকায়ন করা হয়নি। বরং আধুনিক রিখটার স্কেল ও ডিজিটাল কম্পিউটারাইজ প্রযুক্তি স্থাপনের প্রকল্পও মুখ থুবড়ে পড়ছে বলে জানা যায়। ১৯৯৭ সালে ২৯ এপ্রিল একনেক এর এক বৈঠকে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ভূমিকম্প ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার স্থাপনসহ বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। ৩ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্যে এই প্রকল্পের কাজ ৩ বছর সময়ের মধ্যে শেষ হবার কথা থাকলেও গত ৫ বছরেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের 'নিউমেরিক্যাল ওয়েদার প্রিডিকশন টেকনিক্স' স্থাপনের নামে এই প্রকল্পের সম্ভাব্য নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৪ কোটি ৫ লাখ ৪৮ হাজার টাকা। ২০০৩ সালের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত কাজের কোন অগ্রগতি নেই। জানা যায়, অনুমোদনপ্রাপ্ত অর্থ আদায়ের সব ধরনের চেষ্টা-তদবিরের পরেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে। ফলে অর্থাভাবে প্রকল্পের কাজের কোন অগ্রগতি হচ্ছে না।

ভূমিকম্প কবলিত রাঙ্গামাটি ও পার্বত্য এলাকা বিপজ্জনক

গত কয়দিন ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সংবাদ মাধ্যমে ভূমিকম্প সম্পর্কে নানা ধরনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমিকম্পের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। দফায় দফায় ভূমিকম্পে কাঁপছে পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি। বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কায় রাঙ্গামাটি ও আশপাশের এলাকার লোকজন তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। ঘন ঘন কয়েক দফায় সংঘটিত ভূমিকম্পের কারণে স্থানীয় প্রশাসনসহ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে। রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকা কাপ্তাই হ্রদে বিলীন হবার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে বলে

জানা যায়।

পিডিবি সূত্র জানায়, সম্পূর্ণ মাটি দিয়ে তৈরী কাপ্তাই বাঁধ ১৯৬২ সালে নির্মাণের সময় বাঁধের ভূমিকম্প সহনশীলতার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়নি। রাঙ্গামাটির বরকলে গত কয়েকদিনে ৫০ থেকে ৬০ দফায় মৃদু ও মাঝারি ভূমিকম্প হয়েছে। ঘন ঘন ভূমিকম্প অব্যাহত থাকার ফলে পাহাড়ী এলাকা জুড়ে সৃষ্ট বিশাল ফাটলে যে কোন মুহূর্তে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। বর্তমানে এলাকার লোকজন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ইতোমধ্যে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে লোকজন নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। এদিকে সরকারের ঊর্ধ্বতন মহল থেকে সম্প্রতি সারা দেশের ১৭টি সংস্থাকে ভূমিকম্প এবং পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রম বিষয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সরকারী-বেসরকারী ১৭টি সংস্থাকে সতর্ক থাকার নির্দেশের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে জানিয়েছে দ্রুত একটি অ্যাকশন প্লান তৈরী করার জন্য। স্ব-স্ব বিভাগগুলো ভূমিকম্পের পর পরই কি কি ব্যবস্থা নিতে পারে, কিভাবে উদ্ধার প্রক্রিয়া চালানো হবে, কিভাবে সেবা দেয়া হবে এবং কিভাবে ত্রাণ সামগ্রী দুর্গত এলাকায় পৌঁছানো যাবে তা অ্যাকশন প্লানে থাকবে। এছাড়া ভূমিকম্পের বিষয়ে জানতে আবহাওয়া ও জিওলজিকাল সার্ভে বিভাগ যথাক্রমে প্রতিরক্ষা এবং জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সিভিল সার্জেন, স্বাস্থ্য বিভাগ, পুলিশ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত থেকে একযোগে কাজ করবে। এদিকে ভূতত্ত্ব জরিপ অধিদপ্তর সূত্রে

গঠন শক্ত নয়। রাঙ্গামাটি শহর ও পার্শ্ববর্তী বিশাল এলাকা জুড়েই ভূমিকম্পের ফলে যেসব ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও জানমালের জন্য বিপজ্জনক। তাৎক্ষণিক বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে যত দ্রুত সম্ভব এলাকাবাসীকে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দেয়ার উদ্যোগ কার্যকর করতে হবে।

ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন করে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় যতই কলাকৌশল ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক না কেন, ভূমিকম্পের মত বিপজ্জনক অবস্থা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আজও তেমন কোন প্রযুক্তির উন্নতি হয়নি। ফলে ভূমিকম্পের কাছে মানুষ বড়ই অসহায়। ভূমিকম্পের ভয়াবহতার হাত থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই। তবে ভূমিকম্পের পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস জানার কোন কার্যকর প্রযুক্তি না থাকলেও পরবর্তী সময়ে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এ সম্পর্কে জনসচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। তাই সরকারী ও বেসরকারীভাবে এসব বিষয়

নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে। ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের জন্য দেশের শহর ও গ্রাম অঞ্চলে দালান-কোঠা নির্মাণের প্রযুক্তি বিধিমালা যথাযথ মেনে চলা উচিত। বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণ কাঠামো সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক হতে হবে। ভূমিকম্পে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে তা বহুলাংশে নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ঘরবাড়ী ও ভবনাদির অবস্থান এবং শক্ত বুনিয়াদের ওপর। রাজধানী ঢাকা ও বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে যেসব সুউচ্চ ভবন রয়েছে সেগুলো ভূমিকম্পের আঘাত কতটা সইতে পারবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করার প্রয়োজন রয়েছে। জানা যায়, রাজধানী ঢাকাতে প্রায় ৩ হাজার সুউচ্চ ভবন রয়েছে। রাজউকের হিসাব অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীতে প্রায় ১২ হাজার পুরাতন দালান-কোঠা রয়েছে। এসব পুরাতন জরাজীর্ণ ভবন সামান্য ভূ-কম্পনে ধসে পড়ার আশংকা রয়েছে। এসব ভবনের সংস্কার বা ভেঙ্গে পুনরায় নির্মাণ প্রয়োজন। এছাড়া শহরাঞ্চলের বড় বড় ইমারত বা অট্টালিকাসহ বিভিন্ন ভবন নির্মাণে ভূমিকম্পের প্রতিরোধক ব্যবস্থা মেনে চলার ওপর কড়াকড়ি নিশ্চিত ব্যবস্থা বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে। এ যাবত বাংলাদেশে রিখটার স্কেলে যে মাত্রার ভূকম্পন রেকর্ড করা হয়েছে তা খুবই বিপজ্জনক। ভূমিকম্পের মতো মারাত্মক বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। এ বিষয়ে নানামুখী সতর্কতা অবলম্বন করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করাও একান্ত প্রয়োজন। বৃক্ষ নিধন বন্ধ করে এবং পাহাড় কাটার মতো বিপর্যয়কর পরিস্থিতি প্রতিরোধেও আরো কঠোর হতে হবে। পাশাপাশি ভূমিকম্প সংক্রান্ত সকল তথ্য জানা এবং সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের আবহাওয়া ও ভূতত্ত্ব বিভাগকে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসহকারে উন্নতি সাধন করতে হবে। দেশের একমাত্র ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটিকে জরুরী ভিত্তিতে আধুনিকায়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষকে যুগোপযোগী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আরো জটিলতা সৃষ্টি হবে। শুধু চট্টগ্রামেই নয়, ঢাকা, সিলেটসহ দেশের মহানগরীগুলোতে ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে।

ঘন ঘন ভূমিকম্পের ফলে হিমালয়ের চ্যুতি সঞ্চারণ বৃদ্ধি পাচ্ছে

গবেষণার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ বিশ্বের ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের চিহ্নিত স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভূপৃষ্ঠতলের যে টেকটোনিক প্লেটের সঞ্চারণের কারণে ভূমিকম্প হয়ে থাকে তার তিনটি প্লেটের মধ্যস্থলে অবস্থান হলো বাংলাদেশের। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসসি) সূত্রে জানা যায়,

বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার মধ্যে রয়েছে। গত কয়েক বছরে সংঘটিত মাঝারি ও তীব্রতর কয়েকটি ভূমিকম্পের ফলে এসব অঞ্চলে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশংকা বৃদ্ধি পেয়েছে। জানা যায়, গত এক শতাধিক বছরে মোট ১৪টি প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প হয়েছে। ১৪টি বড় ধরনের

হিমালয়ান চ্যুতির সক্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমেরিকার কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের প্রফেসর রজার বিলহাস ও পিটার মনার এবং এই উপমহাদেশের কয়েকজন খ্যাতিমান ভূতত্ত্ববিজ্ঞানীকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ান চ্যুতির ওপর ২০০১ সালে একটি

গবেষণার পর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় দুই হাজার কিলোমিটারব্যাপী এই চ্যুতির অভ্যন্তরে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে যে কোন সময় এই অঞ্চলে রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার চেয়ে বেশী মাত্রায় ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে। গবেষকদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা, কলিকাতা, দিল্লী, কাঠমান্ডু, ইসলামাবাদ ও এর সন্নিহিত বড় শহরগুলোতে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশংকা রয়েছে। এতে করে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হবার আশংকা ছড়িয়ে পড়ছে। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও সিলেটসহ সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলে বড় ধরনের চ্যুতির ফলে যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে এতে পরিস্থিতি আরো বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে। জানা যায়, ভারত-বাংলাদেশ ও নেপাল-বার্মাসহ বড় ধরনের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল হিসেবে চিহ্নিত আরো একটি চ্যুতি হলো তিস্তাচ্যুতি। গত বছরের ২০ জুন রংপুর অঞ্চলে সংঘটিত মাঝারি ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল তিস্তাচ্যুতি। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘন ঘন ভূমিকম্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর তিস্তাচ্যুতিতেও বিপজ্জনক সক্রিয়তা অব্যাহত রয়েছে। ভূতত্ত্ববিদ গষেকদের মতে, অবিরাম সঞ্চারণ প্রক্রিয়ায় হিমালয়ান টেকটোনিক প্লেটের সঙ্গে ভারতীয় প্লেটটি সংযুক্ত হয়ে একটি 'টেকটোনিক লক' সৃষ্টি হয়েছে। এই প্লেট দু'টির পারস্পরিক চাপে লক যখন খুলে যাবে তখনই বড় ধরনের বিপজ্জনক ভূমিকম্প ঘটতে পারে। গবেষকদের তথ্যমতে, পূর্বে এই লক লাইন ধরেই বড় ধরনের ভূমিকম্পগুলো সংঘটিত হয়েছিল। গবেষকদের আশংকা, লক লাইন খুলে গিয়ে বিপজ্জনক ভূমিকম্প সৃষ্টির সময় প্রায় সমাগত।

ভূমিকম্পের মারাত্মক ফ্লট লাইনে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ভূমিকম্পের মারাত্মক বিপজ্জনক ফ্লট লাইনের মধ্যে রয়েছে। বিশেষজ্ঞ গবেষকদের মতে, মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে আন্দামান সাগর হয়ে বৃহত্তর চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারত ও নেপালের হিমালয় পর্বতমালা পর্যন্ত অঞ্চলকে ভূমিকম্পের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষকদের ধারণা, টেকটোনিক প্লেটগুলোর অবিরাম সঞ্চারণ প্রক্রিয়ার ফলে ভারতীয় প্লেটটি উত্তরে এবং মায়ানমারের প্লেটটি দক্ষিণে সঞ্চারণশীল রয়েছে। এই পরস্পর বিরোধী দিকে সঞ্চারণের কারণে ভারতের আসাম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল এলাকাসহ সিলেট, কুমিল্লা এবং আসামের ডায়াসন এলাকাতে ভূমিকম্পের ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, সাম্প্রতিককালে মৃদু, হালকা ও মাঝারি মাত্রায় ঘন ঘন ভূমিকম্পের ফলে বড় ধরনের ভূমিকম্পের পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘের গ্লোবাল সিসিমিক হ্যাজার্ড অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রামের (জিএসএইচএপি) গবেষণা তথ্য অনুযায়ী স্পষ্ট করে বলা আছে, আন্দামান সাগর থেকে শুরু করে নেপালের হিমালয় পর্বতমালা পর্যন্ত দীর্ঘ 'ফ্লট লাইনে' (চ্যুতি রেখা) রয়েছে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। গবেষকরা বলছেন, প্রাকৃতিক বিবর্তনজনিত কারণে ভূগর্ভের শিলাস্তরে (প্লেট) টেকটোনিক মুভমেন্টের ফলে বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার হয়েছে। এই উৎপাদিত প্রচণ্ড শক্তি যে কোন সময়ে প্রলয়ঙ্করী শক্তিতে ভূমিকম্পের আকারে আত্মপ্রকাশের সময় হয়েছে। জানা যায়, ইতোপূর্বে ১৮৯৭ সালে এই একই ফল্ট লাইনের ওপর ভারতের বিহারে রিখটার স্কেলে ৮ দশমিক ৬ মাত্রার প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল। গবেষকদের প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রতি ১২০ থেকে ১৩০ বছর পর পর বড় বড় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। এই তথ্য অনুযায়ী এই ফ্লট লাইনে বড় ধরনের ভূমিকম্প হবার সময় এখন প্রায় সমাগত। গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভূমিকম্পের জন্য চিহ্নিত বিপজ্জনক অঞ্চলগুলোর ফ্লট লাইনে ইতিপূর্বে আরো বেশ কয়টা বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়েছিল। জানা যায়, ১৮৩৩, ১৮৮৫, ১৮৯৭, ১৯০৫, ১৯৩০, ১৯৩৪, ১৯৪৭ এবং ১৯৫০ সালে এই অঞ্চলে সবচেয়ে বিপজ্জনক ও ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল। গবেষকরা বলছেন, রিখটার স্কেলে ৬ থেকে ৭ মাত্রায় ভূমিকম্প হলে চট্টগ্রামের ৮০ থেকে ৯৫ শতাংশ এবং ঢাকা ও সিলেটে ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ দালান-কোঠা ভেঙ্গে পড়তে পারে। ভূমিকম্পের এই ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পেতে নির্মাণ কাঠামো তৈরীর সময় যথাযথ নির্দেশমালা অনুযায়ী তৈরী করা প্রয়োজন।

তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও ভূমিকম্পের পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ধার ও ত্রাণ কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য এখন থেকেই ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সেনাবাহিনীসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলকে এবং স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলোর এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে জাপানের বিভিন্ন কর্মসূচী অনুসরণ করা যেতে পারে।

লেখক ঃ সাংবাদিক, কলামিস্ট ও কবি